হাইকু প্রসঙ্গে

হিমেল সাগর

古池や蛙飛び込む水の音
An old pond—
The sound of a frog jumping
into water

১.

বস্তুজগতের সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ ভাব, চেতনার রঙ, আবেগের মিতব্যয়িতা, অনবদ্য চারুকলা ও কারুকলায় ভরপুর; সর্বজনীন ও সর্বকালীন স্বীকৃতি প্রাপ্ত জাপানি সাহিত্যের একটি ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে 'হাইকু'। একথা সত্য যে, কাব্য-আন্দোলন গড়ে তোলা, পদ্যের ভেদরেখা মুছে দিয়ে জাপানি ভাষায় নবরূপায়ণ ঘটায় তিন-লাইনের কবিতা, যা 'সরোবরের জলের মত স্তব্ধ'। কবি তাঁর ভাবকে রূপরূপান্তর শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রকাশ করতে, একটি বিশেষ রীতিতে অফুরন্ত-সম্ভাবনার একটি মহৎ কীর্তির পথ খোলতে, পাঠকের হৃদয় ও মনকে বিশাল অনবদ্য চিত্রের সামনে উপস্থিত করেন। সুন্দর হয়ে ওঠে আনন্দজনক ও মঙ্গলজনক। সুন্দরের মধ্যে ধরা পড়ে গুণ, পরিমাণ, সম্বন্ধ ও আকৃতি। প্রকৃতিই কবিকে করে উদ্বুদ্ধ, প্রকাশ ঘটায় সৌন্দর্যের। টুকরো-টুকরো রূপ থেকে সৃষ্টি হয় একটি অখণ্ড রূপ। তারপর সমগ্র রূপটি রঙরসে প্রকাশিত হয় সুষম ও সুন্দর প্রতিমায়। এ প্রতিমা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লিখেছেন,

> তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট। সেইজন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এপর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ এবং ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধ। সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখি, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্যভোগের সম্বন্ধ— এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না, এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেইজন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না। / এদের দুটো বিখ্যাত পুরোনো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে:
>
> পুরোনো পুকুর,
> ব্যাঙের লাফ,
> জলের শব্দ।
>
> বাস! আর দরকার নেই। জাপানি পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল— এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কী রকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কী ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে; তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক। / আর একটা কবিতা:
>
> পচা ডাল,
> একটা কাক
> শরৎকাল।
>
> আর বেশি না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই-একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক ব'সে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায়

> আকাশ ম্লান হবার কাল— এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয় তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল। / এখানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়োঃ
>
> স্বর্গ এবং মর্ত হচ্ছে ফুল,
> দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল–
> মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।
>
> আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গমর্তকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর করে দেখছে; ভারতবর্ষ বলছে, এই যে এক বৃন্তে দুই ফুল, স্বর্গ এবং মর্ত, দেবতা এবং বুদ্ধ— মানুষের হৃদয় যদি না থাকত তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত— এই সুন্দরের সৌন্দর্যটিই হচ্ছে মানুষের মধ্যে।
> যাই হোক, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।
>
> মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব করে আর-একটাকে বাড়ানো চলে, এ আমরা দেখেছি। সৌন্দর্যবোধ এবং হৃদয়াবেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব ক'রে সৌন্দর্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে— এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্যের অনুভূতি এখানে এত বেশি করে এবং এমন সর্বত্র দেখতে পাই যে স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও মৌমাছির দিক্‌বোধের মতো, আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে-লোক অত্যন্ত গরিব সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা ক'রেও এক-আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।[১]

২.

'হাইকু' একমনের কথা প্রকাশ করে অন্যমনে সঞ্চিত করে। প্রকাশিত ভাবের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ক্ষমতা দুটোরই সন্ধান পাওয়া যায়। পাওয়া যায় সহজ অর্থবোধ। সাধারণ পাঠক এর অর্থ বুঝেন– হোক শবণে, কথনে বা অন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ায়; অনুভূতিতে, সুরে, উদ্দেশ্যভিত্তিকে। পাঠক পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক মন নিয়ে 'হাইকু'র ভেতরে প্রবেশ করতে পারে সহজে। নিয়মশৃঙ্খলার বন্ধনে 'হাইকু' এনে দেয় পাঠকের মনের সংগঠনে স্থায়ী ও সুচির পরিবর্তন, আবেগের ক্ষেত্রে সঙ্গতিসুষমা; ভাষা পায় গরিমা সমন্বিত এক রচনারীতি থেকে মুক্তি। ভাষা যেখানে সত্য সাহিত্যেও সেখানে সত্য; তাই এ হয়ে ওঠে জাপানি সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠতম শিল্প। 'হাইকু'র উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান না; উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তের উৎকর্ষসাধন, সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ সৃষ্টি।

> A traditional hokku consists of a pattern of approximately 5, 7, and 5 *morae*, phonetic units which only partially correspond to the syllables

[১] জাপান-যাত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

> of languages such as English. It also contains a special *season* word (the *kigo*) descriptive of the season in which the renga is set.[2]

'হাইকু' ১৭ (৫-৭-৫) জাপানি সিলেবলযুক্ত (ছোট স্বরবর্ণ বা ছোট স্বরবর্ণে শেষ হওয়া এক-এক একটা ধ্বনিযুক্ত) তিন মেট্রিক ইউনিটে গঠিত পংক্তিমালা। আবদুর রউফ চৌধুরী ধ্রুপদী 'হাইকু'র বিভক্তকরণরীতি সম্বন্ধে লিখেছেন,

> 'হাইকু' কবিতা সাধারণত লিখা হয়– ৫-৭-৫ জাপানি সিলেবলসের নিয়মে, তিন মেট্রিক ইউনিটে, কল্পনাপ্রবণের দূরত্ব বজায় রেখে; তবে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে ধ্রুপদী 'হাইকু'কে দু-ভাগে বিভক্ত করার রীতি চোখে পড়ে। প্রথমত— প্রত্যেকটি 'হাইকু'তে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় শব্দের ব্যবহার— যা পাঠককে বুঝিয়ে দেয় সময়, বিশেষ করে ঋতুর অধিকার; যেমন— 'হাইকু'তে 'বরফ'এর উল্লেখ থাকলে বুঝে নিতে হবে সময়টা 'শীতকাল', 'মশা'র উল্লেখ মানে 'গ্রীষ্মকাল', 'চেরিফোটা'র উল্লেখ মানে 'বসন্তকাল', 'বৃষ্টি'র উল্লেখ মানে 'বর্ষাকাল', 'পাতাঝরা'র উল্লেখ মানে 'শরৎকাল' প্রভৃতি। দ্বিতীয়— কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা চিত্র 'হাইকু'র পরতে পরতে আবদ্ধ থাকবেই; ঘটনা বা চিত্রটি অতীতের নয়, বর্তমান বা পুরাঘটিত বর্তমানের; সাধারণত ঘটনার কারণটিও উল্লেখিত থাকে।[৩]

৩.

> The exact origin of hokku is still subject to debate, but it is generally agreed that it originated from the classical linked verse form called *renga* (連歌).[4]

চতুর্দশ শতকে জাপানে এক ধরনের কবিতা প্রচলিত ছিল, 'রেংগা'। 'রেংগা' প্রায় হলিখেলার রঙ মাখানোর মতো ব্যাপার। একজন কবি সম্পূর্ণ 'রেংগা' লিখতেন না, কয়েক জনের সমন্বয়ে এক-একটি 'রেংগা' লেখা হত; অর্থাৎ, 'রেংগা'র প্রথম তিনপংক্তি (৫-৭-৫) মাত্রানিয়মে। প্রথম তিনপংক্তি যে সৃষ্টি করতেন তাঁর দায়িত্ব ও গুরুত্ব ছিল অনেক; কারণ, এ তিনপংক্তি ঘিরেই সৃষ্টি হত বাকি অংশগুলো; আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ তিনপংক্তি ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভক। দ্বিতীয় কবি প্রথম তিনপংক্তির সঙ্গে যুক্ত করতেন পরের (৭-৭) জাপানি সিলেবলের দুটি লাইন, এরপর অন্য এক কবি (৫-৭-৫) বা (৭-৭) মাত্রানিয়মে লিখতেন আরও তিনপংক্তি, এরকম চলত যতক্ষণ পর্যন্ত না কবিতাটি প্রায় একশ' পংক্তিতে পরিবর্তন হত।

পঞ্চদশ শতকে জাপানি সাহিত্যে আসে 'হাইকাই'; অর্থাৎ, হিউমার; হাস্যরস। দেখতে দেখতে 'হাইকাই' প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে জাপানির মধ্যে। 'হাইকাই' ছিল পাঁচপংক্তির কবিতা। ১৭ (৫-৭-৫) সিলেবলের তিনপংক্তির সঙ্গে ১৪ (৭-৭) সিলেবলের দুইপংক্তি মিলে সৃষ্টি হত। 'রেংগা' ও 'হাইকাই'এর (৫-৭-৫) নিয়মের প্রথম তিনপুংক্তিকে বলে 'হক্কু'। (৫-৭-৫) ও (৭-৭) মাত্রানিয়মের পংক্তিকে 'ট্যাংকা' বা 'তাকানা' বলে। 'হাইকাইরেংগা' যোগসন্ধিতে সৃষ্টি কবিতাকে 'রেংকু' নাম দেওয়া হয়।

---

[2] Wikipedia, the free encyclopedia.
[৩] নথিপত্র, আবদুর রউফ চৌধুরী।
[4] Wikipedia, the free encyclopedia.

ষষ্ঠদশ শতকে বাশো মাতশুয়ো (১৬৪৪-১৬৯৪)-এর দক্ষতায় 'হাইকাই' একেবারে অন্য জিনিস হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এতে একটি বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়, 'কিগো'– প্রকৃতি বা ঋতু বিষয়ক শব্দের সংযোগ। বাশো ছিলেন প্রকৃতির সাধক, তাঁর নামের অর্থ কলাগাছ। ১৬৮১ সালের দিকে বাশো বসবাস শুরু করেন কলাগাছ ঘেরা একটি কুটিরে, প্রকৃতির প্রতি তাঁর আত্মার টানই এতে প্রকাশ পায়। তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় প্রকৃতির গন্ধ, ঋতুর কানাকানি। এসবকে ঘিরে কবির যেন সর্বপ্রেম, সর্বগুঞ্জন, সর্বমুখরতা প্রকাশ পায়। হৃদয়ের অর্ঘ্য বারবার তাদেরই উদ্দেশে উপহৃত করেন বাশো। প্রকৃতি কবিকে এক দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট করে, বহুকালের আকর্ষণে।

বাশো'র পিতা ছিলেন 'আইগা' প্রদেশের একজন নিম্নশ্রেণীভূক্ত 'সামোরাই'; বাশোও পিতার মতো একজন 'সামোরাই' হিসেবে ভূপতি টোদো ইয়শিতাদার অধিনে চাকুরি লাভ করেন। বাশো'র ভূপতি ছিলেন 'হাইকাই' প্রেমিক; তাই তিনি এ-কাব্য চর্চায় লিপ্ত হন, 'সোবো' ছদ্মনামে প্রকাশ করতে থাকেন। বাশো ছিলেন ভ্রমণ প্রিয়ও; জাপানের উত্তর অঞ্চল ভ্রমণকালে যে কবিতা গ্রন্থ লিখেন তার নাম দেন 'ওকে নো হোসোমিছি'। সকল পন্ডিতই এ কথা স্বীকার করেন যে, 'হাইকাই'-এর চেহারা বদলে যায় বাশো'র দক্ষ হাতের স্পর্শে, প্রকৃতি হয়ে ওঠে কেন্দ্রবিন্দু, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে আসে নবচিত্রকল্প, ভাষা হয়ে ওঠে সহজ, সজল ও শোভন। অতীতের কঠিন ও কঠোর নিয়ম ভেঙে যায় রঙরস ও হাস্যকৌতুকের জোয়ারে। আভাসে আসে কাব্যিক গাম্ভীর্য। বাশো'র স্পর্শে কবিতায় আসে এক ধরনের সৌন্দর্যবোধ ও নিঃসঙ্গতা; সৃষ্টি হয় আনন্দ ও বেদনার মিশ্রণে। ধীরে ধীরে বাশো'র সংস্পর্শে 'হাইকাই' হয়ে ওঠে শান্ত, সুমিত ও গভীর। এক কথায় বাশো'র কবিতাগুলো নাটকীয়তায় ভরপুর; এর সঙ্গে হাস্যকৌতুক, এ্যাসট্রেসি ও কনফিউশন; ফলে নাটকীয়তায় ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে। কিছু কিছু হাস্যকৌতুক বাশো সৃষ্টি করেন যা সাধারণ মানুষের মাথায় এর আগে আসেনি। অসাধারণ কৌতুক সৃষ্টির কর্তাই তিনি। বাশো'র কাব্যসাহিত্যে মানুষ যেভাবে এসেছে তা প্রকৃতির চেয়ে ক্ষুদ্র; কিন্তু প্রকৃতি তাঁর মহত্ত্ব ও শক্তি নিয়ে বিশাল আঁকার ধারণ করে আছে। বাশো'র দক্ষ হাতের গুণে কবিতায় আসে কবির অভিজ্ঞ অনুসঙ্গ। দেখার সঠিক দৃষ্টি। বাশো'র কয়েকটি কবিতা–

১. কোমল বরফ
পাতাকে নুয়ে দেয়
দূরে জংনকিউ তলী।

২. কেউ ভ্রমণ করে না
এ পথে— কিন্তু আমি,
এক শরৎ সন্ধ্যা।

৩. মেঘের ভিড়
দেহ বিশ্রাম নেয়
চাঁদ না-দেখার জন্য।

৪. তুমি আসবে না!
নিঃসঙ্গতা? একটি পাতা
'কিরি' গাছে।

৫. মন্দিরঘন্টা আস্তে আস্তে
নিশ্চুপ— আগরগন্ধ
সম্পূর্ণ এক সন্ধ্যা।

৬. গরীবের শিশু
চাল ভাঙছে
চাঁদ দেখছে

সপ্তদশ শতকে 'হাইকাই', 'রেংগা' বা 'রেংকু' জনপ্রিয়তা হারাতে থাকলে, চিত্রশিল্পী ও কবি বুশোন ইয়াসো (১৭১৬-১৭৮৩)-এর তুলিতে রাঙিয়ে ওঠে আবার 'হাইকাই'র জগৎ। বাশো'র গাম্ভীর্য অনুসরণ করে, বাশো,র ভ্রমণ কাহিনীর ছবি এঁকে ও দক্ষ আঁকিয়ের কুশলতা গ্রহণ করে তিনি এক নতুনত্ব নিয়ে

আসেন কবিতায়, যা হয়ে ওঠে স্বচ্ছ পানির উপর পাথরের বুকে শরতের শুকনো পাতার খেলা। তাঁর বলিষ্ঠ চিত্রধর্মীতা ও কবিত্বধর্মীতায় এমন জগৎ সৃষ্টি হয়, যা হয়ে ওঠে সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। প্রকৃতি যেন তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নেয় আপন আবেগে; এর সঙ্গে জীবনের নানা নাটকীয় ব্যাপারও। তাঁর কবিতা চিত্রানুগ; বর্ণনামূলক— বাস্তবতার চেয়ে কল্পনার দখলেই বেশি। বুশোন চান ভিতরের স্বরূপকে উদঘাটন করতে, বাইরের রূপ তো সকলই সহজে দেখতে পায়, কিন্তু ভেতরের রূপ তো সে-ই দেখতে বা উপলব্ধি করতে পারে যার দেখার ক্ষমতা আছে; তাই অন্তরের স্বরূপ তাঁকে বেশি আকষ্ট করে। বুশোন জাপানি সাহিত্যের সবশাখাতেই অবাধ বিচরণ করেন; যেমনি ভাষাকে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন তেমনি বিষয়বস্তুর গভীরে অনুপ্রবেশ ও বিস্তারে আধিপত্তার ছোঁয়া পেলেছেন। বুশোন ইয়াসোর কয়েকটি কবিতা–

১. জমিতে লাঙ্গল
স্থির মেঘ
উড়ে যায়।

২. ঘুড়ি আকাশে
উড়ে সেখানে
যেখানে ছিল গতকাল।

৩. বসন্ত সন্ধ্যা।
অর্ধেক পুড়া আগরে
যুক্ত করি।

৪. গ্রীষ্ম রাত
শিশির কণা
শুঁয়াপোকার পিঠে।

অষ্টদশ শতকের কোনো এক সময়েই 'হক্কু' শব্দকে শিকির মাশাওকা (১৮৬৭-১৯০২) 'হাইকু' নামে বেঁধে দেন। তিনিই আধুনিক 'হাইকু'র প্রবর্তক। একই সঙ্গে তিনি বাশো'র সাহিত্যকর্মকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে 'হাইকু'কে 'হক্কু' ও 'হাইকাই'র অধীন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেন। ভাষা ও বাণীতে পূর্ণতা দিয়ে এতে নিয়ে আসেন স্বতন্ত্রতা। অন্যদিকে তিনি পাঁচ-লাইনের 'ট্যাংকা' তৈরিতেও মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে শিকির মাশাওকার সাহিত্যে এ দুইশাখায় আধিপত্ত লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায় অতি সংক্ষিপ্ত রচনাশৈলী; ধ্রুপদী নিয়মকে অমান্য করে নয়; অর্থাৎ, (৫-৭-৫) সিলেবল ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তুর ব্যবহার। শিকির মাশাওকার কয়েকটি কবিতা–

১. পুকুরে পদ্মপাতা
জলে ঘোড়া চড়ে
বর্ষার বৃষ্টি।

২. ফাঁপা পাথর
আইভি ঝুলছে
ছোট এক মন্দির।

৩. বিদ্যুৎ চমক
বন্যগাছের ফাঁকে
জল দেখি।

৪. ঘৃণা ও প্রেম
বাড়ি দিয়ে মাছি মারি
পিঁপড়াকেও দেই।

৪.

বাংলায় বেশ কিছু 'হাইকু' সৃষ্টি করেছেন সালেহা চৌধুরী। রুদ্র-গরু-স্বপ্ন নিয়ে যেন কারবার। আবার স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে হাওয়া হয়ে যায় যেন। কবি যেন স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন দেখেন। তাঁর স্বপ্ন যেন স্বপ্ন থাকে না, থাকে বাস্তব। বাস্তব যন্ত্রণা থেকে একজন কবি সার্থকতার সন্ধান পান। কবি প্রকৃতকে সন্ধান করেন, কিন্তু পায়ের তলার মাটি খুঁজে পান না– এ হচ্ছে একজন প্রকৃত কবির পরিচয়। এগুলো বর্ণনামূলক, অন্তর্নিহিত অর্থ আছে অবশ্য। সে অর্থ বাস্তবতার সন্ধান দেয়। সালেহা চৌধুরীর 'হাইকু' সম্বন্ধে আবিদ আজাদ লিখেছেন,

> .... তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: গীতলতা ও চিত্রময়তা। ছোট্ট ছোট্ট পঙক্তির মধ্য দিয়ে তিনি রচনা করেন তাঁর স্বপ্ন, বিশ্বাস এবং অনুভূতিকে— একটি অনুপম নক্সী কাঁথার মতো। তাঁর প্রতিদিনের জীবন যাপনের চিত্র যেমন তিনি অনায়সে কবিতায় তুলে নিতে পারেন তেমনি ভাবে গভীর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বাজিয়ে দিতে পারেন কানে শোনা শব্দপুঞ্জকে। তাঁর কবিতার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে পরিস্রুত বোধ ও মনের কারুমিতি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন ভাবের মিতব্যয়িতা— সালেহা চৌধুরীর কবিতা তারই ছবি।[৫]

এ অংশে সালেহা চৌধুরীর কয়েকটি 'হাইকু' নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাক।

১. গরু ও পাল্কি
বাঁশ বনের পথ
নতুন বউ

যথেষ্ট. অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একের পর এক দৃশ্য, কল্পনার দোয়ার খোলে যায়। বাঁশবনের নিস্তব্ধ পথে একটি গরু— হয়ত-বা তার গলায় দাড়ি, ঘাস খাচ্ছে— চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পায় একটি পাল্কি এগিয়ে চলেছে। মুহূর্তে ছয়বেহারা হু-না-হু বলে পাল্কিটিকে নিয়ে যায়। এ একটু সময়ের ভেতর বউয়ের মুখটি দেখতেও কষ্ট হয় না। কবি শুধু সূত্রপাত করেছেন— পাঠকের এখন তার ইচ্ছে মতো ক্যানভাসটা ভরে নিতে অসুবিধে হবে না।

২. বর্ষার শব্দ
মশারী দেয়াল
গোটানো কাঁথা

বর্ষা! বর্ষার সময় বাংলাদেশে একটানা বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টিতে মানুষের জীবন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ওঠে। মশারী পর্যন্ত গোটানোর প্রয়োজন পড়ে না, দেয়ালের পাশে ঝুলে থাক্ না, আপত্তি নেই; তবে কাঁথাকে গোটিয়ে রাখতে হয়; জলে ভিজে গেলে উপায় থাকবে না। বাঙালি পাঠক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায় জগতের আধমারা মানুষের সঙ্গে। আর বুঝিয়ে দিতে হয় না।

[৫] হাইকু, সালেহা চৌধুরী।

৩. চাঁদ ঝুলছে
মেঘ ফিকে জ্যোছ্না
পার্কের পথ

ব্যাস! আর বলার প্রয়োজন নেই। আকাশে একটি চাঁদ ঝুলছে। মাঝে মাঝে মেঘ তার আপন মনে খেলা করছে। জ্যোৎস্নাও পার্কের পথ দিয়ে এগিয়ে যায়, আড়ি পেতে, অভিমান করে। এ অভিমানের মধ্যে বন্দি পড়ে পাঠক। কবি সৃষ্টি করে দিয়েছেন পরিবেশ; পাঠক এঁকে নিচ্ছে বাকি ছবিটি, বিশাল ছবি।

৪. ঝড়ের যাত্রী
নৌকোর দুলুনি
মাতাল নদী

অজস্র স্রোতস্বিনীর দেশ বাংলাদেশ। বর্ষাকালে কোনো কোনো অঞ্চলে নৌকা ব্যবহার ছাড়া চলাচল অপরিহার্য। ঝড়ের দিন হোক বা না-হোক যাত্রীকে নৌকাযোগে নদী পাড় হতে হয়; তবে ঝড়ের দিন হলে অন্য কথা। খেয়া নৌকায় উঠলেই পা দুটি হাঁটু কাঁপতে থাকে, কোমর সোজা করে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। তারপর উপর নদী মাতাল হলে তো কথাই নেই, নৌকা দোলতে থাকে, তরণীতে তরতর করে বাড়ে পানি, গলুইতে বসা মাঝির বৈঠা চালানোর নিপুণতায়ও খেয়াতরী পাতালপুরী বা জলপরীর দেশে যেতে কতোক্ষণ। বাকিটুকু পাঠকই নিজের কল্পনার তুলি দিয়ে সাজিয়ে নিতে সক্ষম।

৫. ভাতের ঘ্রাণ
কলাপাতার থালা
মানুষ দল

এ তিন-লাইনে যা আঁকা হয়েছে তার চেয়ে বেশি বলার প্রয়োজন পড়ে না। এই যথেষ্ট। পাঠকের অভিজ্ঞতা থেকেই বাকি চিত্রটা পূরণ করা যায়। এতে অতীত নয়; বর্তমানই বলিষ্ঠভাবে স্থান দখল করে আছে। এ কল্পনাশ্রয়ী নয়; বাস্তব— একেবারে বাস্তব ছবি। এখানে কবির বেদনা সাধারণ মানুষের জন্যে। মাপা ভাষায় প্রকাশ করেন দুঃখের তীব্রতাকে। তীব্র ভাষা বা মর্মান্তিক আক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে না। তিন লাইনেই জীবনের বিড়ম্বনাকে সুতীব্র করা হয়েছে মাত্র। এতেই ভেতরের বিষাদের সুর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বাজতে থাকে। কল্পনা মুক্ত হয়ে পড়ে। অভাবের করুণ ছবি অনুভূতির সাহায্যে পাঠকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে।

৬. মাঠের মাঝে
গরুর শুকনো জিভ
সূর্য আগুন

মাঠের মাঝে একটি তৃষিত গরু দাঁড়িয়ে আছে। পানির অভাবে বুক ফেঁটে যাচ্ছে। শুকনো জিহ্বা বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ। তবুও পানির কানো সন্ধান নেই। সূর্যের আগুনই যেন চারিদিকে। মৃত্যুর এক রিক্ত ও করুণ ছবিই যেন এতে প্রকাশ পায়। এখানে প্রকৃতির করুণরূপটিই ধরা পড়ে।